বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

পূর্ববাংলায় লবণ সংকট (১৯৫০-১৯৫১)

সাজেদা বেগম*

সারসংক্ষেপ

দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় সৃষ্ট নানামুখী সংকটের মধ্যে ১৯৫০-৫১ সালের লবণ সংকট ছিল অন্যতম। আলোচ্য সময়ে এ অঞ্চলে লবণের দুষ্প্রাপ্যতার সাথে সাথে এর মূল্যও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। লবণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে গেলে সরকার পাকিস্তানের বাইরে থেকে লবণ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে দেশের বাইরে থেকে কম দামে লবণ পাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। উপকূলীয় এলাকায় লবণ তৈরির যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এতে জনমনে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রাম, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা সম্পাদিত হলেও ১৯৫০-৫১ সালের লবণ সংকট নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে অনালোচিত লবণ সংকট নিয়ে গবেষণা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণায় লবণ সংকট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উল্লেখিত সংবাদ এবং সরকারের লবণ নীতিসহ বিভিন্ন আরকাইভাল ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। পূর্ববাংলায় এ সময়ে যে লবণ সংকট দেখা দিয়েছিল তা কেন হয়েছিল, কীভাবে হয়েছিল এবং তার ফলাফল কী হয়েছিল তা বর্তমান গবেষণায় বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

চাবি শব্দ : পূর্ববাংলা, লবণ সংকট, জনদুর্ভোগ, সরকারি পদক্ষেপ

১. ভূমিকা

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরপর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। ধান, চাল, তেল, হলুদ, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। শুরুতেই দেশটির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নানা ধরনের সংকটের সাথে পূর্ববাংলায় খাদ্য সংকট যুক্ত করে ভিন্ন মাত্রা। বলা প্রয়োজন, পূর্ববাংলা আগে থেকেই অবহেলিত থাকায় সংকটের মাত্রা ছিল বেশি। ১৯৫০-৫১ কালপর্বে এই সংকটের সাথে যুক্ত হয় লবণ সংকট। কেবল ঢাকা শহরের বাজারগুলোতেই নয় সমগ্র প্রদেশে দুই-তিন আনা মূল্যের প্রতিসের লবণ বিক্রি হয়েছে ১৫-১৬ টাকায়। পূর্ববাংলার জনসাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় এই পণ্যটি তখন বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। লবণ উৎপাদনের অঞ্চল যেমন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী থেকে সংকটপূর্ণ এলাকায় লবণ সরবরাহ করতে সরকারি নীতির অব্যবস্থাপনা সংকটকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। অথচ পূর্ববাংলায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালী ও বরিশালের উপকূল অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লবণ উৎপাদনের ওপর উচ্চহারে ট্যাক্স বসিয়ে এ সম্ভাবনা নস্যাৎ করা হয়। উপরন্তু করাচি থেকে আমদানি করার লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় লবণ উৎপাদনের

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু লবণের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকারি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ প্রতীয়মান হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদকীয় কলামে লবণের মূল্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। লবণের এই মূল্য বৃদ্ধি এবং এর ফলে যে সংকট তৈরি হয় সে সম্পর্কে আমাদের জানামতে কোনো গবেষণা বা অনুসন্ধান হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৫০-৫১ সালের লবণ সংকটকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে দুই ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে ১৯৪৭ সাল পরবর্তী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে *দৈনিক আজাদ*, *নওবেলাল*, এবং বিভিন্ন আরকাইভাল তথ্য যেমন গেজেট, গেজেটিয়ার, সরকারি আদেশ-প্রজ্ঞাপন, জেলা পর্যায়ের রেকর্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য হিসেবে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২. পূর্ববাংলা লবণ-নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫০ ও সংকটের সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সারা বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছিল। যার প্রভাব পূর্ববাংলাতেও লক্ষণীয়। এর মধ্যে লবণের সংকট বা মন্দা অব্যাহত ছিল। তবে এই মন্দা যতটা না বৈশ্বিক ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল আঞ্চলিক। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সংকটগুলো দেখা দিয়েছিল সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার লবণ সংকটটি স্বতন্ত্র এবং বর্তমান গবেষণা বিষয়ের কাল-পরিসর ১৯৫০-৫১। বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যদিও গুরুত্বপূর্ণ তবে পূর্ববাংলার লবণের ক্ষেত্রে তা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। পূর্ববাংলাতেও ১৯৪৫-৪৬ সালের পর থেকে প্রতিটি জিনিসের মূল্য বেড়ে যায়। তবে অন্য জিনিসপত্রের চেয়ে খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে চালের মূল্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ সালে পূর্ববাংলার সমস্ত জেলায় চালের মূল্য মনপ্রতি গড়ে ১৭ টাকা ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর দেখা যায় পূর্ববাংলার চালের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৪০ থেকে ৫০ টাকা।[১] বস্তুত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববাংলার খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ায় সরবরাহ ছিল অনেক কম। সরবরাহ কম থাকায় খাদ্যের মূল্যও ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ বিপুল খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়।[২] ১৯৪৯ সালে এসে খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। তবে ১৯৫০ সালের দিকে উৎপাদন ভালো হওয়ায় খাদ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু অল্পদিনের ব্যবধানেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।[৩]

১৯৫১ সালের শুরুর দিকে পূর্ব বাংলায় খাদ্য পরিস্থিতি পুনরায় ভেঙে পড়ে। ঐ বছরেই খাদ্য সমস্যার সাথে লবণ সংকট যুক্ত হলে দুর্দশা সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ববাংলার সর্বত্রই লবণ সংকট চরম আকার ধারণ করে। কৃষকদের মাথাপিছু লবণ ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ দুই আনা মূল্যের লবণের দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬ টাকা। ১৯৫০ সালের ৩০ আগস্ট 'পূর্ব বাংলা লবণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ' পাস হওয়ার পর লবণের দাম বৃদ্ধি

পেতে থাকে।[৪] এই আদেশের মাধ্যমে পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করে স্থানীয় অফিসারদের নির্ধারিত মূল্যে লবণ বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তবে খুচরা ব্যবসায় এই আদেশের বাইরে ছিল। প্রাদেশিক সরকারের 'লবণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ ৩১ আগস্ট, ১৯৫০'-এর মাধমে জনসাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে যায়। পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে লবণ জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে বহুবার হাতবদল হয় এবং মূল্য বেড়ে যায় বস্তাপ্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত। এর ফলে চোরাচালান ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।[৫] ১৯৫১ সালের দিকে পূর্বাংলার নারায়ণগঞ্জ জেলার কোথাও লবণ পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া গেছে তবে তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অনেকেই এই লবণ ক্রয় করেছে ১০ থেকে ১৫ টাকা সের দরে। বরিশালের উজিরপুর এলাকায় প্রতিসের লবণ ৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। তবে সন্ধ্যার পর লবণের দাম বেড়ে হয়েছে ৬ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত। ফরিদপুরে বিক্রি হয়েছে ৫ থেকে ৬ টাকা। তবু লবণ সময়মতো পাওয়া যেতো না। ঢাকায় ৩ টাকা সের এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় লবণ সেরপ্রতি ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণের অভাবে এই মহকুমার পল্লি অঞ্চলে 'লবণ দুর্ভিক্ষ' দেখা দিয়েছে। অসামরিক বিভাগ ডিলারদের মাধ্যমে প্রত্যেক ইউনিয়নে কিছু লবণ প্রেরণ করলেও ডিলাররা তা মাঝপথেই চোরাবাজারে বিক্রি করে দিতো। নোয়াখালীতে লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সরবরাহ বিভাগ থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক ইউনিটে মাত্র এক ছটাক লবণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটিও পর্যাপ্ত না থাকায় তা রীতিমতো পাওয়া যেতো না।[৬]

দৌলতখাঁনে লবণের অভাবে জনগণ অসুবিধায় পড়েছে। লবণের মূল্য প্রতিসের চার টাকা ছিল কিন্তু সেটাও প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যেতো না। বিক্রমপুরের হাট-বাজারগুলোতে লবণের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বলা হচ্ছিল দাম আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কালিগঞ্জে রেশন কার্ডে সামান্য পরিমাণ লবণ দিলেও বাজারে প্রতিসের লবণ বেশি মূল্যে বিক্রি হতো। নেত্রকোণায় লবণের মূল্য ছিল সেরপ্রতি ৮ টাকা।[৭] লবণের মূল্য বৃদ্ধি পূর্ববাংলার জনগণকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছিল। অল্প কিছুদিন আগেও লবণের দাম ১ টাকা এবং ১ টাকা ৪ আনা পর্যন্ত ছিল। এই মূল্যেই গরীব জনসাধারণের পক্ষে লবণ কিনে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না। সেখানে ১৬ টাকা সের লবণ কেনা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পূর্ববাংলার জনসাধারণের লবণের চাহিদা ছিল বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ মণ। কিন্তু কুটির শিল্পের মাধ্যমে কেবল ৩০ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এর ওপর আবার সরকার লবণের ওপর শুল্ক ধার্য করেছিল। এমনিতেই লবণের অভাব তার ওপর লবণের ওপর শুল্ক ধার্য এই দুই মিলে জনসাধারণের দুর্দশা ভীষণ বাড়তে থাকে। ইতঃপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে কখনই লবণ ১ টাকায় বিক্রি হয়নি। করাচিতে লবণের যথেষ্ট মজুত থাকায় লবণের মূল্য ২ আনার বেশি ছিল না।[৮] করাচিতে লবণ সেরপ্রতি ২ আনা বিক্রি হলেও পূর্ববাংলায় তা ছিল ৬ আনা থেকে ৮ আনা।[৯] লবণের মূল্যে এই ব্যাপক পার্থক্যের কারণে সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে ছাত্ররা একত্র হয়ে মিছিল বের করে সরবরাহ মন্ত্রী সৈয়দ আফজালের বাসভবনে যায়। এরপর সেক্রেটারিয়েটের সামনে গিয়ে তারা শ্লোগান দেয়, 'সরবরাহ মন্ত্রী গদি ছাড়', 'লবণ কেলেঙ্কারির তদন্ত চাই', 'চোরাকারবারি কালোবাজারি বন্ধ কর।' এই বিক্ষোভের পর ঢাকা রেশনিং কর্তৃপক্ষ

ছাত্রাবাসগুলোতে কিছু পরিমাণ লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না।[১০]

পূর্ববাংলায় লবণ সংকট তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৫১ সালের শেষ দিকে। কেবল ঢাকা শহরের বাজারগুলোতেই চার আনা মূল্যের লবণ বিক্রি হয়েছে ৮ টাকায়। ১৯৫১ সালে সৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়:

> লবণ লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তা সম্পূর্ণ মানুষের তৈরী। কেন্দ্রীয় সরকার এই শিল্পের উপর এত বেশি ট্যাক্স বসাইয়াছে এবং বাধা নিষেধ আরোপ করিয়াছে যে তাহাতে প্রদেশে লবণ উৎপাদন করিবার কোন আশাই করা যায় না। অন্যদিকে সরকার বিদেশ হইতে লবণ আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় বাহির হইতে কম দামে লবণ পাওয়ার সমস্ত পথই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই ভারতে যখন তিন আনা দরে রাশিয়ার লবণ বিক্রয় হইতেছে তখন আমরা করাচির লবণ কিনিতে গিয়া প্রতি সেরের জন্য ৮/৯ টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইতেছি।[১১]

এর থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্ববাজারে যে লবণের মূল্য মাত্র চার আনা সেই লবণ ৮/৯ টাকা মূল্যে ক্রয় করতে গিয়ে পূর্ববাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে নিদারুণ কষ্ট করতে হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় হওয়ায় জনগণও দ্রব্যটি বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। আর দরিদ্র জনগণের পরিশ্রমে অর্জিত এই অর্থ বিদেশি পুঁজিপতিরা ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

২ (ক) সংকটের কারণ

লবণ সংকটের প্রধান কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা, লবণের ওপর অত্যধিক আমদানি শুল্ক এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় লবণ আমদানিতে সরকারের ব্যর্থতা। পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়িক স্বার্থেই মূলত লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। দুর্দশা বৃদ্ধি পেলেও এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো সংগঠনের প্রতিরোধ ছিল না।[১২] ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি শওকত হোসেন ১৯৫১ সালে লবণ সংকট সম্পর্কে বলেন, লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে পূর্ববাংলার সর্বত্রই বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল করাচি থেকে লবণের অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং সরকার নিযুক্ত লোভী আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি লবণ তৈরির কারখানা ছিল এবং সেখানে বছরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হতো। বছরে সেখানে খরচ হতো ৬ লক্ষ মণ লবণ। কিন্তু পূর্ববাংলায় বছরে ৭৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও এখানে লবণ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত কোনো কারখানা ছিল না। ফলে বছরে এখানে প্রায় ৩৯ লক্ষ মণ লবণের ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি বা দেশের বাইরে থেকে লবণ আমদানি করে লবণ সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সরকার দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বাইরে থেকে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়। শওকত হোসেন বলেন, তিনি সরকারকে ভারত ও অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্র থেকে লবণ আমদানির অনুমতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। আবার খাদ্য মন্ত্রীর কাছে এমন সুপারিশ করলেও এ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।[১৩] বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমান বলেন, সম্পূর্ণ

দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক সরকারের ওপর। সরবরাহ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকার লবণের সঠিক বণ্টন বা বিতরণ করতে পারেনি। আর প্রাদেশিক সরকারের এই অবহেলার কারণেই লবণের দাম বেড়ে যায়। সরবরাহ সচিব বলেছেন, লবণের মূল্য সর্বোচ্চ বেড়েছে সেরপ্রতি ৬ টাকা। তিনি বলেন যে, রাজশাহীতে লবণের দাম অনেক কম ছিল অর্থাৎ সের প্রতি ১ টাকা মাত্র। আবার নবাবগঞ্জেও লবণের দাম ছিল সের প্রতি মাত্র ১ টাকা। মূলত সীমান্ত এলাকায় লবণ চোরাচালান হয়ে আসত বলে সেখানে লবণের দাম অনেক কম ছিল। রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে চোরাকারবারির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা লবণ বিক্রি করেছে বলেই লবণের মূল্য এত কম ছিল। অথচ অন্যান্য জায়গায় অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জেই লবণের মূল্য সেরপ্রতি ছিল ১৫ ও ১৬ টাকা।[১৪] ত্রিপুরার ভাঁকশারেও সেরপ্রতি লবণ বিক্রি হয়েছে ১৬ টাকায়।[১৫] কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির কথা তৎকালীন সরকার স্বীকার করেনি।

শওকত হোসেন পূর্ববাংলায় লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণ উল্লেখ করে বলেন, লবণ সংকট সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মতামত দিলেও এর আসল কারণ কারও জানা ছিল না। তবে করাচি থেকে অপর্যাপ্ত সরবরাহই লবণ সংকটের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভই বর্তমান পরিস্থিতির কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকার কর্তৃক লবণ আমদানি বন্ধের কারণেই লবণের নিশ্চিত ঘাটতি দেখা দেয়।[১৬]

১৯৪৮ সালের জুন মাসে লিখিত *"A Few Words on Salt Industry in East Bengal"* নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এসময় পূর্ববাংলায় লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হলো–

জেলা	লবণ উৎপাদনের সাথে জড়িত কর্মচারীর সংখ্যা	উৎপাদনের পরিমাণ (মণ হিসেবে)
খুলনা	৬০,০০০	১,৭০,০০০
নোয়াখালী	২,৫০,০০০	১,০০,০০০
চট্টগ্রাম	৫০,০০০	২,০০,০০০[১৭]

(সূত্র: Government of Bengal & East Pakistan, Department : Commerce, Branch : Labour, Proceedings: B, Sl No: 01, List No: 106, Year 1953, p. 4.)

আবার সমুদ্র ও স্থলপথে পূর্ববাংলায় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত লবণ আমদানির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়–

- দেশভাগের আগে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যম সমুদ্রপথে লবণ আমদানি করা হয় ৩০ লক্ষ মণ।
- এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে মার্চ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যম সমুদ্রপথে লবণ আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৮ লক্ষ মণ।
- আবার এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে মার্চ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যম স্থলপথে পূর্ববাংলায় লবণ আমদানির পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ মণ।[১৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এসময় চট্টগ্রামসহ খুলনা ও নোয়াখালী জেলারও লবণ উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। ওইসব জেলায় লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং এর ফলে প্রদেশের লবণের চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করা হয়।[১৯]

কিন্তু পূর্ববাংলার অন্যতম এই কুটির শিল্প লবণ দেশভাগের আগে সমাদৃত থাকলেও দেশভাগের পর তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। প্রদেশের লবণের চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যারা লবণ উৎপাদন করতেন তাদের জমির খাজনা উচ্চহারে বৃদ্ধি করা হয়। অন্য জমির জন্য যেখানে খাজনা দিতে হতো বিঘা প্রতি ১২ আনা সেখানে কেবলমাত্র লবণ উৎপাদনের জন্য জোতদার শ্রেণিকে খাজনা দিতে হতো বিঘা প্রতি ৫০ টাকা।[২০] পূর্ববাংলায় লবণ তৈরি হতো। কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা এই লবণ তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ১৯৫১ সালের দিকে পূর্ববাংলায় লবণ সংকট তৈরি হয়। সরকারি দমননীতির ভয়ে সাধারণ জনগণ এই লবণের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেনি।[২১]

২ (খ) সংকট মোকাবিলায় সরকারি পদক্ষেপ

পূর্ববাংলায় প্রতি মাসে লবণের চাহিদা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ মণ। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রদেশে লবণের যে অভাব দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে লবণ প্রেরণেরও ব্যবস্থা করেছে। এরই মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ লবণ জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি আরও প্রেরণ করা হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব পীরজাদা আবদুস সাত্তার। প্রাদেশিক সরবরাহ সচিব সৈয়দ আফজাল হোসেন বলেন, 'পূর্ববাংলায় লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।'[২২] প্রদেশের লবণ সংকট মোকাবিলায় পূর্ববঙ্গ সরকার রেশন গ্রাহকদেরকে লবণ সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারি স্টোর, রেশন দোকান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক পরিচালিত দোকান প্রভৃতি থেকে তাদেরকে লবণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে মিহি লবণ পাঁচ আনা এবং মোটা লবণ চার আনা সের দরে রেশন কার্ডে সরবরাহ করা হবে বলেও স্থির করা হয়।[২৩]

লবণের অভাব দূর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রাদেশিক সরকার আদর্শ কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অল্প মূলধন দিয়ে ৭টি কারখানা স্থাপন করার কথা বলা হয়। এর মধ্যে খুলনায় ২টি, কক্সবাজারে ৩টি, নোয়াখালীতে ১টি এবং বাকেরগঞ্জে (বর্তমান বরিশাল) ১টি কারখানা স্থাপনের কথা বলা হয়। এছাড়া যেকোনো উপকূলীয় অঞ্চলের উপযুক্ত স্থানকে 'লবণ এলাকা' বলে ঘোষণা করে তা খাসমহলের আওতায় নিয়ে আসার এবং লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ঘোষণা করে সরকার। ফলে লবণের উৎপাদন বেড়ে যাবে এবং মণপ্রতি ৪ টাকা হারে লবণ পাওয়া যাবে। এই ৭টি কারখানা থেকে মোট ৩৫ হাজার মণ লবণ উৎপাদিত হবে যার মূল্য প্রায় ১,৪০,০০০ টাকা।[২৪] প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন করাচি থেকে ৭ থেকে ৮ লক্ষ মণ লবণ পূর্ববাংলায় আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ লবণ সংকটের কারণ তারা দেখাতে

পারেননি। পূর্ববাংলায় কেন এই সংকট দেখা দিয়েছিল, লবণের মজুত কোথাও আছে কিনা এসব কিছু বিবেচনা বা তদারকি ছাড়াই হঠাৎ করে করাচি থেকে লবণ আমদানি করা হয়।[২৫] প্রদেশের লবণের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে এক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার মণ লবণ পূর্ববাংলায় প্রেরণ করা হবে বলে সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয়। এরপর করাচি থেকে আরও ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার মণ লবণ পূর্ববাংলায় আসবে। মোটকথা ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই এখানে লবণ আমদানি করা হবে ১১ লক্ষ মণ। ফলে লবণের মূল্য ও অভাব দুটাই কমে আসবে।[২৬]

পূর্ববাংলায় খুব সহজেই ৮০ লক্ষ মণ লবণ তৈরি করা যেতো। তা না করে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে লবণ আমদানি করা হয়েছে যা ছিল বিলেত থেকে লবণ আমদানি করার মতো। এখান থেকে বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ লবণ আমদানি করা হতো।[২৭] লবণ আমদানি না করে প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সস্তায় জনসাধারণের নিকট লবণ পৌঁছানোর জন্য দ্রব্যটির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। প্রদেশের ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদনের জন্য সরকার ৬ মাসের জন্য বরাদ্দ রেখেছে মাত্র ১৮ হাজার টাকা। ফলে উৎপাদন কম হয়েছে এবং সংকটের মাত্রা বেড়ে গেছে। পূর্ববাংলায় যদি ঠিকমতো এবং পর্যাপ্ত লবণ তৈরি করা যেতো তাহলে দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি লোকের প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদনের পরেও বিদেশে লবণ রপ্তানি সম্ভব হতো। কিন্তু তা না করে পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়।[২৮]

লবণের মোট উৎপাদন নির্দিষ্ট করার আগে বাণিজ্যিকভাবে লবণ উৎপাদনের স্থান এবং বাজার বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল, যেখানে সহজ যাতায়াতের মাধ্যমে লবণ পরিবহন সম্ভব হবে। সমুদ্রের নিকটবর্তী মহেশখালী ও কুতুবদিয়া দ্বীপে লবণ উৎপাদন করে সহজেই চট্টগ্রাম বন্দরে পরিবহন করা যেতো। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে রেলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারেও পরিবহন করা যেতো।[২৯] কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা না করে লবণ চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ছাঁটাই এবং লবণের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেয়। আবার শর্ত প্রদান করা হয় যে, এখন পশ্চিমাঞ্চল থেকে ৩০ লক্ষ মণ লবণের পরিবর্তে ১ কোটি মণ লবণ আমদানি করা হবে। অর্থাৎ পূর্ববাংলাকে লবণের জন্য সম্পূর্ণভাবে করাচির ওপর নির্ভর করে রাখতে চেয়েছিল সরকার। সেই সাথে তাদের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ না করা।[৩০]

করাচি থেকে একচেটিয়াভাবে লবণ সরবরাহের কারণে ব্যবসায়ীরা লবণের মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। প্রাদেশিক সরকার লবণের মূল্যে ন্যায়সঙ্গত সমতা আনতে একটি সংবিধিবদ্ধ আইন জারি করে। তদনুসারে পূর্ববাংলা লবণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রচার করা হয় ১৯৫০ সালের ৩০ আগস্ট। এই আদেশের মাধ্যমে পাইকারি মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। প্রয়োজন হলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামে লবণ বিতরণ করবে। তবে লবণের খুচরা বিক্রি বর্জন করা হয়। কারণ পূর্ববাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য লবণের সরবরাহ প্রদেশের হাট-বাজারগুলোতে ছিল অনেক কম। লবণের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ছোট ছোট অফিসে দুর্নীতি দেখা দেয়। তাই প্রাদেশিক সরকার বলেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের লবণ সরবরাহ বৃদ্ধি

করবে এবং প্রদেশ সরকারি হিসাব অনুযায়ী লবণ আমদানি করবে। কিন্তু এটি সম্ভব হয়নি কারণ সরকার নিজেদেরকেই লবণ বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিল। সরকার ১৯৫০ সালের ১৩ নভেম্বর "সামুদ্রিক লবণ নিয়ন্ত্রণ আইন" জারি করে লবণের ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ সকল কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।[৩১]

লবণের মূল্য যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তখন করাচি থেকে লবণভর্তি জাহাজ চলে আসে পূর্ববাংলায়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লবণভর্তি ৪টি জাহাজ চট্টগ্রামে এবং ১টি চালনা বন্দরে এসে পৌঁছায় করাচি থেকে ৭,৪৬,৪২৯ মণ লবণ নিয়ে। নভেম্বরের মধ্যে ৮,৮৭,০০০ মণ লবণ নিয়ে ৬টি জাহাজ আসে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে ১০,০০,০০০ মণ লবণ আমদানির পরিকল্পনা করে এবং প্রদেশে মাসে নিয়মিতভাবে ৭,০০,০০০ মণ লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করে। এসকল পরিকল্পনার কারণে ৯ থেকে ১০ লক্ষ মণ লবণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে ৬ সপ্তাহে ১৬,৩৩,০০০ মণ লবণ পাওয়া সম্ভব হয়। স্থানীয় অফিসারদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহকৃত লবণ বিতরণ করার আদেশ দেওয়া হয়। কিছু অফিসার এসকল নিয়ম মেনে লবণ বিতরণ শুরু করেছিল। তবে কাজগুলো দ্রুতগতিতে করার ফলে কালোবাজারির অভিযোগ আসতে থাকে। স্থানীয়ভাবে এর জন্য শাস্তির ঘোষণাও দেওয়া হয়েছিল। তারপরও লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।[৩২]

অনেক লোভী মুনাফাখোর ব্যবসায়ী লবণ সংকটের সময় উচ্চমূল্যে লবণ বিক্রি করে লাভবান হয়েছে। কিন্তু সরকারি পক্ষ থেকে এসব অসাধু ব্যবসায়ীক নিয়ন্ত্রণ করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সসহ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সরকার এই লোভী ব্যবসায়ীদের শাস্তির বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্ব সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ওপর ন্যস্ত থাকলেও এ বিভাগ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কারণ যখনই কোনো দ্রব্যের সংকট মোকাবিলার দায়িত্ব এ বিভাগকে দেওয়া হয়েছে, তখনই সেই সংকট না কমে তা আরও বেড়ে গেছে। দীর্ঘ সময় লবণের সংকট থাকলেও লবণ আমদানি করে সংকট মোকাবিলার পদক্ষেপ দেখা যায়নি।[৩৩] সরবরাহ বিভাগ যে লবণ সরবরাহ করে তা অপরিষ্কার ও খাওয়ার অনুপযুক্ত। অথচ নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে যে লবণ তৈরি হয় তা ছিল অনেক পরিষ্কার ও ভালো। তা সত্ত্বেও সরকার প্রদেশের লবণের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করে করাচি থেকে আমদানি করেছে।[৩৪] তবে দাবি করা হয় যে, সরকার লবণ সমস্যা সমাধানে লবণের ওপর থেকে দুই বছরের জন্য আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। ১৯৫১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী দুই বছর এই নির্দেশ বহাল থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যে, ৬ মাসের উপযোগী লবণ পূর্ববাংলায় মজুত করা হবে। যতদিন পর্যন্ত মজুদ সম্পন্ন হবে না ততোদিন পর্যন্ত সরকার প্রতিমাসে ৭ লক্ষ মণ লবণ পূর্ববাংলায় প্রেরণ করবে।[৩৫] তবে পূর্ববাংলা প্রদেশের লবণ সংকটের সমাধানে সরকার পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের দূরত্বকে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। দূরত্বের কারণে লবণ পূর্ববাংলায় রপ্তানি করা সম্ভব হয় না বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী অর্থসচিব গিয়াসুদ্দীন পাঠান। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ হাজার মাইলের

ব্যবধান এবং পর্যাপ্ত যানবাহন বিশেষ করে জাহাজের অভাব। তাই সময়মতো লবণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। বহু চেষ্টার পর সরকারের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ধার করে কয়েকটি পাকিস্তানি জাহাজ কেনা হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। অল্প সংখ্যক ও পুরনো হওয়ায় জাহাজগুলো দিয়ে করাচি থেকে চট্টগ্রামে লবণ আনা সম্ভব হতো না।[৩৬]

পূর্ববাংলা সরকার লবণ উৎপাদনকারীদের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আবগারি কালেক্টরের কাছে নাম রেজিস্ট্রোশনের পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু খবর পাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় আবগারি কর্তৃপক্ষ লবণ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে লবণ কর আদায় করছে। বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আবগারি কর্তৃপক্ষ প্রদেশে উৎপাদিত লবণের ওপর মণপ্রতি আড়াই টাকা হিসাবে আবগারি শুল্ক নিতে পারে। ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ লবণ বিধির ৮ নং ধারা অনুসারে আবেদনের মাধ্যমে এই শুল্ক হতে অব্যহতি পাওয়ারও বিধান রয়েছে। রেজিস্ট্রিকৃত যেসকল লবণ উৎপাদনকারী বছরে তিনশত মণের বেশি লবণ উৎপাদন করে না কেবলমাত্র তাদেরকেই এই শুল্ক থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। আর যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করেনি তাদেরকে শুল্ক দিতে হয়েছে। ফলে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক সামান্য সুবিধা পেলেও অধিকাংশই লবণ শুল্ক প্রদান করে সমস্যায় পড়েছে।[৩৭] এ সময়ে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদন করেছে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি লোক। তাদেরকে যদি আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যেতো এবং শুল্ক তুলে দেওয়া হতো তাহলে লবণের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতো।[৩৮] সরকারি হিসেব মতে পূর্ববাংলায় মাসে ৬ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে প্রয়োজনীয় লবণের অর্ধেক লবণও প্রেরণ করা হয়নি। এর কারণ ছিল সরকার নিযুক্ত পাইকারি আড়তদার কর্তৃক বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ সরিয়ে ফেলা। লবণ ব্যবসায়ে ব্যর্থতার কারণে সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন মুসলিম বণিক সমিতির প্রেসিডেন্ট রফিউদ্দীন সিদ্দিকী। পূর্ববাংলায় বার্ষিক যে ৬৬ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন তা কেবল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করে মেটানো সম্ভব নয়। তাই সরকারকে তিনি অবিলম্বে লবণের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক তুলে দিতে এবং আমদানিকারকদের ইচ্ছানুযায়ী লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করতে অনুরোধ জানান।[৩৯]

লবণের ওপর থেকে কর তুলে দিয়েছিলেন লিয়াকত আলী খান। কিন্তু পুনরায় লবণের ওপর ট্যাক্স বসানো হলে লবণের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। লবণের উৎপাদন নিশ্চিত করতে ট্যাক্স তুলে দেওয়ার পাশাপাশি লবণের কন্ট্রোল বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল।[৪০] আবার লবণ আমদানির জন্য যে লাইসেন্স প্রয়োজন হতো সেটিও তুলে দেওয়ার দরকার ছিল। কারণ লাইসেন্সের জন্য অনেকেই লবণ আমদানিতে উৎসাহী হতো না। পূর্ববাংলার লবণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন লবণের ওপর কর রহিতকরণ, বিনা লাইসেন্সে লবণ আমদানির অনুমতি দান, চোরাকারবার ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদির অনুরোধ করা হয় সরকারের নিকট। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার ছিল উদাসীন।[৪১]

চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কুটির শিল্পরূপে যে লবণ উৎপন্ন হয় তার উন্নতির জন্য সুপারিশ করেছিলেন ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে লবণ উৎপাদন করার জন্য সরকারি কারখানা স্থাপনেরও সুপারিশ করে কমিটি। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার উপযোগী স্থানসমূহকে লবণ এলাকা হিসেবে ঘোষণার কথাও বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল চট্টগ্রামের কক্সবাজার মহকুমার গুদাতালী এলাকাটি। এখানকার নদীর পানি অত্যন্ত লোনা এবং লবণ উৎপাদিত হয় বেসরকারিভাবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে লবণ উৎপাদন করা হলে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতো। কারণ কুটির শিল্পের মাধ্যমে যে লবণ উৎপাদিত হয় তা ৬ লক্ষ মণের বেশি নয়। কিন্তু লবণ উৎপাদনের জন্য কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি বলে লবণের উৎপাদনও কম হয়েছে।[৪২]

লবণ সমস্যা সমাধানে ১৯৫১ সালে সরকার ৭ টাকা দরে প্রতিমণ লবণ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রদেশের বাইরে থেকে আমদানিকৃত লবণের মূল্যের চেয়ে এই দাম ছিল বেশি। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য হবে না বলে স্থানীয় উৎপাদনকারীরা আমদানিকৃত লবণের সাথে টিকে থাকতে পারবে। প্রাদেশিক বেসামরিক সরবরাহ সচিব এস এম আফজাল হোসেন বলেন যে, স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৩]

লবণ সংকট এড়ানোর জন্য ১৯৫১ সালের শেষে এসে সরবরাহের পুরো দায়িত্ব নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সরকার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। লবণের সংকট ও মূল্য অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমান।[৪৪] সিভিল সাপ্লাই বিভাগের মন্ত্রী এস এম আফজাল হোসেনের পক্ষ থেকে পনিরুদ্দীন আহমেদ জানান যে, লবণ সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত লবণ প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে। করাচির পাশাপাশি ভারত থেকেও আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ভারত থেকে ৪,৬৬,৫৭০ মণ লবণ আমদানি করা হয়। এ ছাড়াও পরবর্তী সময়ে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরও লবণ আমদানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪৫] প্রদেশে লবণ আমদানির দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের ওপর ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারই পূর্ববাংলা প্রদেশের ডিলারদের কাছে লবণ সরবরাহ করতো। তা সত্ত্বেও পূর্ববাংলার সংকটকালীন সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম লবণ আমদানি করা হয়েছে। পূর্ববাংলার চাহিদা অনুযায়ী লবণ আমদানি করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে বাইরে থেকে লবণ আমদানি করতে অনুমতি দেয়নি। সরকার-বিরোধী মনোভাব কঠিন আকার ধারণ করলে লবণ সংকট মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়।[৪৬] তাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে বিভিন্ন দল মিলে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফত দল একসাথে মিলে গঠন করে যুক্তফন্ট। এই যুক্তফ্রন্ট তাদের যে নির্বাচনী ইশতেহার (২১ দফা) প্রকাশ করে তার পঞ্চম দফা ছিল—

> পূর্ববাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে বৃহৎ লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ সরকারের আমলে যে বৃহৎ লবণ সংকট দেখা দিয়েছিল সেই কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান করা হবে ও অসদুপায়ে তারা এযাবৎ যেসকল অর্থ উপার্জন করেছে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।[৪৭]

মূলত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকার কর্তৃক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে লবণ সরবরাহে অব্যবস্থাপনার কারণেই নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং লবণ দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

৩. জনজীবনে লবণ সংকটের প্রভাব

লবণ সংকটের ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষের আহার প্রস্তুতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লবণ। পান্তাভাত খেতে গেলেও তাদের লবণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর সেই সময় লবণের এই মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনের জন্য কতটা ভয়াবহ হয়েছিল তা অচিন্তনীয়।[৪৮]

সংবাদপত্রগুলোতে যেসকল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে নানারকম ভোগান্তির শিকার হয়েছে সাধারণ জনগণ। তারা উচ্চমূল্যে লবণ ক্রয় করতে পারত না বলে মাঝে মাঝে বিনা লবণে আহার করতে বাধ্য হতো। অন্যদিকে অধিক লাভের আশায় লবণের সাথে বিভিন্ন ভেজাল দ্রব্য যেমন হাড়ের গুঁড়ো (Bone-dust) মিশিয়ে লবণ বিক্রি করেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। আর এই ভেজাল লবণ গ্রহণের ফলে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে জনসাধারণের পেটের অসুখ হয়েছে এবং অনেকে মারাও গিয়েছে। বরিশালে লবণের সাথে চিনি মিশিয়ে লবণ বিক্রি করা হয়েছে।[৪৯] এতে সাধারণ জনগণ অসুবিধায় পড়লেও লাভবান হয়েছে অসৎ ব্যবসায়ীরা। লবণ বিক্রি করে তারা অধিক মুনাফা অর্জন করেছে।

১৯৫১ সালের ২৬ অক্টোবর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় লবণ সংকটের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। এখানে বলা হয়, লবণের সংকট এতোটাই তীব্র ছিল যে অনেকে লবণের পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করেছে। গ্রামাঞ্চলের জনদুর্ভোগ বর্ণনা করে মীর আহমদ আলী নামক এক ব্যক্তি উল্লেখ করেন:

> পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত লবণের দাম এ রকম হয় নাই। গ্রামে গরিবদের দুর্দশার সীমা নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে জ্বাল দিলে যে পরিমাণ না জ্বলে দুঃখীর আত্মনিনাদ তার চেয়ে বেশী জ্বলে। ১৬ টাকা দরে লবণ বিক্রয় হ'ল তাতে গরীবের কোটি কোটি টাকার সর্বনাশ হয়ে গেল।[৫০]

পূর্ববাংলার এই সংকটের সময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব ছিল ভিন্নতর। পূর্ববাংলার জনগণ এ সময়ে বেশি দামে লবণ ক্রয় করলেও তাদের জন্য বিদেশ থেকে লবণ আমদানির ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ সময়ে চা ও পান আমদানি করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। কারণ তাদের চা ও পানের চাহিদা অনুযায়ী যোগান ছিল না। আমদানি পণ্যে বৈষম্য থেকে বোঝা যায় পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ছিল যথেষ্ট।[৫১] লবণের সংকট মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে লবণ সরাসরি পূর্ববাংলায় আমদানি করার প্রয়োজন ছিল। অথচ লবণ আমদানির সময় প্রথমে লবণ আসবে করাচিতে এরপর পূর্ববাংলায় এ নীতি গ্রহণ

করেছিল সরকার। বিভিন্ন কোম্পানিকে লবণ আমদানির অনুমতিও দিয়েছিল সরকার। কিন্তু এমন সব ব্যক্তিকে আমদানির অনুমতি দেয়া হয় যারা কখনই লবণ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন না। ফলে আমদানি ব্যর্থ হয় এবং সমস্যা দেখা দেয়। আবার এ পর্যন্ত যে সকল ব্যবসায়ী লবণের মজুত করেছে তাদের মজুতকৃত লবণ জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এদিকে তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি। লবণের উৎপাদনের ওপর শুল্ক আরোপের ফলে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গার লবণ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং লবণ তৈরির ওপর কর বসানোর কারণে এ সংকট আরও বেড়ে যায়।[৫২]

স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিভিন্ন দ্রব্য বা পদার্থ সংরক্ষণে এবং বিভিন্ন শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি দ্রব্য হলো লবণ। তাই এই লবণ সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অনেক আগে থেকেই বাংলা প্রদেশ ভারত বা বিদেশ থেকে লবণ আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ শিল্পকে রক্ষা করতে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও সেগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক। পূর্ববাংলার স্থানীয় শিল্পকারখানা রক্ষা বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লবণ উৎপাদনের জন্য বাস্তবধর্মী কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।[৫৩]

দেশে উৎপাদিত এ দ্রব্যটির সংকট মোকাবিলায় সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যে ও শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লবণের অভাব গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা ব্যাপকভাবে অনুভব করতে থাকে। সংবাদভিত্তিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও সরকার সমর্থিত *মাসিক মোহাম্মদী* এবং *দিলরুবা* লবণ সংকটের জন্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে। তবে জনগণের এই দুর্দশার সময় বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমান ৩১ অক্টোবর *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*'কে বলেন, "লবণ সংকট সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো ছিল অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।" সরকার পক্ষের এসকল বক্তব্য জনমনে সে সময়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[৫৪]

সরকারের স্বজনপ্রীতির কারণেও জনদুর্ভোগ দেখা দেয়। সরকার তাদের সমর্থনপুষ্ট লোকদের লবণ ব্যবসার সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। ফলে জীবিকা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্রেই দুদর্শায় পতিত হয় জনসাধারণ। প্রদেশের লবণ উৎপাদনের ওপর শুল্ক তুলে দিলে পূর্ববাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হতো। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে লবণের দিক দিয়ে পূর্ববাংলা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো তেমনি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হতো। এ সময়ে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে লবণ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল ১০ হাজারেরও বেশি লোক। কিন্তু অর্থনৈতিক কোনো ক্ষতিপূরণ তারা পায়নি।[৫৫] জনজীবনে দুর্দশা বৃদ্ধি পেলেও তা নিরসনে সর্বদলের সংঘবদ্ধ কোনো ত্রাণ কমিটি ছিল না। সরকারি খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সাংগঠনিক প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলার বামপন্থি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উল্লেখযোগ্য কোনো ত্রাণ কমিটি লক্ষ করা যায় না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ত্রাণ কমিটি গঠিত হলেও সেগুলো সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে পারেনি। এতে জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[৫৬]

৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায় দেশভাগ পরবর্তী সময়কালে সৃষ্ট লবণ সংকট পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য ভীষণ কষ্ট ও দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল। সংকটের কারণে লবণের মূল্য এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জনগণ উচ্চমূল্যে লবণ ক্রয় করতে না পেরে বিনা লবণে খাবার খেয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কারণে ঢাকা রেশনিং কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসগুলোতে কিছু পরিমাণ লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। লবণ সংকটের মূল কারণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন লবণকে পূর্ববাংলায় সরবরাহ করার প্রচেষ্টা। অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফালোভী কর্মকাণ্ড, ক্ষমতাসীন দলের কিছু ব্যক্তির দুর্নীতি ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য, আমদানি ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে পক্ষপাত পূর্ববাংলার খাদ্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। লবণ সংকট সাময়িক হলেও জনজীবনে এর তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে, এর প্রভাব পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়েও অনুভূত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা এই সংকট উল্লেখ করে জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু খাদ্য ঘাটতি নিরসনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা সরকারি নীতি যথেষ্ট ছিল না। পরিস্থিতির মোকাবিলা বা চোরাকারবারি বন্ধ করে ঘাটতিপূর্ণ এলাকায় লবণ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে সরকার কঠোর ও কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকারের অবহেলা ও যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে কৃষকরা উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপাদনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় লবণ তৈরির সম্ভাবনা সত্ত্বেও সরকার করাচি থেকে লবণ আমদানি করে। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ববাংলায় জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে মতোবিরোধ ছিল তার প্রভাব পূর্ববাংলার খাদ্য ও লবণ সংকটের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। আর এর ফলে বিপন্ন হয় পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

তথ্যনির্দেশ

১ আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১৮

২ S. Sajjad Husain, *East Pakistan A Profile, Orient Longmasn Limited, Dacca*, 1962, p. 194

৩ রেজোয়ান সিদ্দিকী (সম্পাদিত), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয়:* ১৯৩৬-১৯৭১, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৫৩

৪ আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, *পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০২

৫ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (দ্বিতীয় খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১০৭

৬ *দৈনিক আজাদ*, ৩০ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ৫
৭ *প্রাগুক্ত*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৫১
৮ *Assembly Proceedings Official Repor*t, East Bengal Legislative Assembly, Fifth Session, March 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953, pp. 410, 411
৯ *দৈনিক আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮, পৃ. ১
১০ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯। *দৈনিক আজাদ*, ২৯ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ১
১১ আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১৫
১২ Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh: Class Struggles in East Pakistan* (1947-1958), Vol-1, Oxford University Press: Karachi, pp. 25-26
১৩ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২২১
১৪ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, November 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953, p. 144
১৫ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০
১৬ *দৈনিক আজাদ*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৫১
১৭ *Government of Bengal & East Pakistan*, Department: Commerce, Branch: Labour, Proceedings: B, Sl. No: 1, List No: 106, Year 1953, p. 4
১৮ *Ibid,* p. 4
১৯ *Ibid*, p. 5
২০ *Assembly Proceedings*, Third Session, 28th September 1956, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957, p. 16
২১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮২
২২ *দৈনিক আজাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৫১, পৃ. ৫
২৩ *প্রাগুক্ত*, ২০ অক্টোবর ১৯৫১
২৪ *প্রাগুক্ত*, ৮ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ১
২৫ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op.Cit.*, p. 141
২৬ *প্রাগুক্ত*, ৪ অক্টোবর ১৯৫১
২৭ মোছাঃ খোদেজা খাতুন, 'পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৭-'৭১: পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া', পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ১২৪
২৮ *Assembly Proceedings*, Third Session, *Op. cit.*, p. 75
২৯ *Government of Bengal & East Pakistan*, *Op. cit.*, p. 3
৩০ মোছাঃ খোদেজা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৩১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২২
৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
৩৪ *Assembly Proceedings*, Tenth Session, March 1953, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 486
৩৫ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ১
৩৬ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯। *দৈনিক আজাদ*, ৩ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ১
৩৭ *দৈনিক আজাদ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ১,৩,
৩৮ *প্রাগুক্ত*, ১০ এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ২
৩৯ *প্রাগুক্ত*, ৯ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ৮

৪০ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op. cit.*, p. 145
৪১ *দৈনিক আজাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ২
৪২ *প্রাগুক্ত*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, পৃ. ১
৪৩ *প্রাগুক্ত*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পৃ. ১
৪৪ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op. cit.*, p. 143
৪৫ *Ibid*, Ninth Session, November 1952, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 262
৪৬ *দৈনিক আজাদ*, ২১ অক্টোবর ১৯৫১, পৃ. ১
৪৭ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৩
৪৮ *নওবেলাল*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৫১
৪৯ *Assembly Proceedings*, Sixth Session, *Op. cit.*, p. 144
৫০ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫
৫১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১
৫২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮
৫৩ *Government of Bengal & East Pakistan*, *Op. cit.*, p. 3
৫৪ মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র ১৯৪৭-১৯৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৫
৫৫ বিস্তারিত, *দৈনিক আজাদ*, ১০ এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ২। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮২
৫৬ Badruddin Umar, 2004, *Op. cit.*, pp. 25-26